ডিসটোপিয়ার সাথে লড়াই

শমীক সরকার

মেশিন

মেশিন বা যন্ত্র আমাদের অস্তিত্বের মধ্যেই আজ ঢুকে গেছে। বহু খুঁজেও হয়ত এমন লোক পাওয়া যাবে না, যে কোনও না কোনও একটা মেশিন রোজ ব্যবহার করে না। আগে মেশিন শুধু পাওয়া যেত কারখানায়। মেশিন ছিল উৎপাদনের উপকরণ মাত্র। এখন তা সর্বত্র। হাতের মোবাইলের চেয়ে উৎকৃষ্ট মেশিন আশেপাশে খুঁজে পাওয়া ভার। এই অবস্থায় আমরা শুরু করতে পারি যে প্রশ্নটা দিয়ে, তা হল, মেশিন কী? যন্ত্র কী? তবে তার আগে যে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে নিতে হবে, তা হল— যন্তর কী? টুল কী? টুল বা যন্তর হল যা পারিপার্শ্বিককে একটু গড়ে পিঠে নেবার সক্ষমতা বাড়ায়। পারিপার্শ্বিককে অদলবদল করে নেবার বাসনাকে সাকার করে। সবচেয়ে সহজ টুল হল একটা পাথর। একটা লাঠি। যন্ত্র বা মেশিন হল সেই টুল বা যন্তরগুলির অ্যাসেম্বলি বা সমাবেশ। অর্থাৎ বাসনাগুলির সমাবেশ। আমাদের শরীরের মধ্যেও নানা যন্তর ও যন্ত্র কাজ করে। যেমন আমাদের হাত। যার মধ্যে কনুই নামে একটা হিঞ্জ জয়েন্ট বা কবজা আছে। কনুই-এর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আছে গোটা ছয়েক মাংসপেশী। হাত ওরকম বলেই আমরা সামনের কোনও কিছু হাতে নিয়ে মুখে পুরে দিতে পারি। কনুইকে বলা যেতে পারে একটা সমাবেশ বিন্দু বা অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট। হাতের সেরকমই আরো কিছু সমাবেশ বিন্দু হল কবজি, আঙুলের গাঁট। সেখানে নানা হাড় এবং মাংসপেশীগুলি জোড়া লাগে। হাড়ের জয়েন্ট বা কবজা, পেশীর জয়েন্ট বা টেনডন বা বাংলায় কণ্ডরা— এগুলো হল টুলগুলির অ্যাসেম্বলি পয়েন্ট। যন্ত্রে যন্তরগুলির সমাবেশ বিন্দু। বলা যেতে পারে, হাত নামক যন্ত্রটি এরকম নানা যন্তর-এর সমাবেশ। ফলে মেশিনকে যদি মানুষের বাইরের কিছু বলে আলাদা না করা হয়, তাহলে বলা যায়, মেশিন হচ্ছে আমাদের বাসনার সমাবেশ। বস্তু মেশিন হল মানুষী মেশিনের বাহির। অর্থাৎ, মানুষের বাসনার এক্সটেনশন বা সম্প্রসারণ। আমরা যা করতে চাই, কিন্তু করতে পারি না, বা যেভাবে করতে চাই সেভাবে করতে পারি না, আমাদের তৈরি মেশিন সেগুলি করে দেয়।

মেশিনের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল, মানুষের তৈরি যে কোনও মেশিনেই মানুষের আদল আছে। ইদানিং সেই আদল আরও স্পষ্ট হচ্ছে। প্রথম দিকে মেশিনগুলি ছিল বড়ো, জাবদা। সেগুলি চালানোর জন্য প্রচুর শক্তির প্রয়োজন হত। সেগুলি চালনা করার জন্য সারাক্ষণ মানুষ লাগত। এইভাবেই চলেছে দশকের পর দশক। খুব বড়ো জাবদা মেশিন মূলতঃ পাওয়া যেত কারখানায়। তা ছিল উৎপাদনের উপকরণ। মেশিন চলতে গেলে শক্তি লাগবেই। কৃত্রিম শক্তি উৎপাদন করা শুরু হবার পর মেশিনের জগতে পরিবর্তন এসেছিল। আরো গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরিবর্তন এসেছিল মেশিনকে চালনা করার কাজে মানুষের ভূমিকার পরিবর্তনগুলির মধ্যে দিয়ে। মেশিনের রূপান্তরে এই পরিবর্তনগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। যেমন, লেদ মেশিনে অর্থাৎ যে মেশিন দিয়ে যন্ত্রাংশ বানানো হয় ড্রিল, চিজেল ইত্যাদি আলাদা আলাদা টুলগুলির মাধ্যমে। তার টুল বা যন্তরগুলিকে এমনভাবে পরিবর্তন করা হতে লাগল, এমন সব বৈচিত্র্য আনা হতে লাগল, যাতে লেদ মেশিন যে চালাচ্ছে, সেই মিস্তিরি-র দক্ষতার ওপর আর সেই প্রক্রিয়া বা অপারেশনটাকে খুব বেশি নির্ভর করতে না হয়। তুলনায় অদক্ষ মিস্তিরি দিয়ে কাজটা হয়ে যায়। এর কারণ হল, কারখানায় মেশিনগুলিকে চালাতো যে মিস্তিরি-রা তারা এতটাই দক্ষ ছিল, যে তাদের বাদ দিয়ে একটা যন্ত্রাংশ সুষ্ঠুভাবে হত না। ফলে সেই মিস্তিরি-র ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকত গোটা উৎপাদনটা। এটা বিলক্ষণ বুঝত মিস্তিরি। ফলে কারখানার মালিকের সঙ্গে দরকষাকষি করত বিস্তর। দক্ষ মিস্তিরি-র দর কষাকষি এখনও ছোটো ছোটো লেদ মেশিন কারখানায় দেখা যায়। হয়ত সব জায়গাতেই দেখা যায়। সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। কিন্তু এটা প্রথমে ভাবা দরকার, কারখানায় উৎপাদনের উপকরণ মেশিনটির মালিক যদি নিজেই দক্ষ মিস্তিরি হত, বা দক্ষ মিস্তিরি-রা একযোগে যদি মেশিনটির মালিক হত, তাহলে কি লেদ মেশিনের টুলগুলির এই ধরনের বৈচিত্র্য আসত? অর্থাৎ, মেশিনকে যদি তার চালককে দাবানোর একটা অস্ত্র হিসেবে না দেখা হত, তাহলে কি এই যে নানা ধরনের টুল তৈরি করা হল, সেগুলি কি তৈরি করা হত? দক্ষ যন্ত্রী হাতের আন্দাজে যে বিচিত্র কাট-গুলি দিয়ে ফেলতে পারে একটা টুল দিয়েই, অদক্ষ যন্ত্রী তা পারে না, তার জন্য লাগে ওই কাট-গুলি দেবার জন্য উপযুক্ত টুল বা যন্তর। উৎপাদনের প্রক্রিয়া থেকে শ্রমিকদের আধিপত্য হ্রাস করার উপায় হিসেবে মেশিনের বিবর্তন পরিচালিত হতে লাগল। এবার আসা যাক ফেলে আসা প্রসঙ্গটাতে। তাহলে এখনও কেন দক্ষ মিস্তিরিদের কদর রয়েছে যে কোনও উৎপাদন প্রক্রিয়ায়? কারণ, মেশিন-এর যে বিবর্তনই হোক না কেন, তাতে কিছু দক্ষ মিস্তিরি লাগবেই। তবে তাদের আপেক্ষিক সংখ্যা নিঃসন্দেহে কমেছে। যে কোনও উৎপাদন প্রক্রিয়ায় যে ঠিকা অদক্ষ শ্রমিকের আপেক্ষিক পরিমাণ গত

কয়েক দশকে বেড়েই চলেছে, তা প্রমাণ করে, এখনও মেশিন চালায় যারা, তাদের বাসনা বা ইচ্ছা অনুযায়ী মেশিনের বিবর্তন তো হচ্ছেই না, বরং যন্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস যন্ত্রীর বাসনার পরিপন্থী।

মেশিনের বিবর্তনের যে পর্যায়ে আমরা এখন রয়েছি, তা হল, এখন মেশিনগুলি বানানো হচ্ছে আগের তুলনায় অনেক বেশি মানুষের মতো করে। যেমন আগের লেদ মেশিন ছিল আমাদের হাতের এক্সটেনশন। অর্থাৎ হাত দিয়ে যা করা যায় না কিন্তু যে কাজ হাত ছাড়া আমাদের অন্য কোনও অঙ্গ দিয়ে করার কথা ভাবা যায় না, সেই কাজ হবে লেদ মেশিন দিয়ে। এখন মেশিনের চোখও তৈরি করা হচ্ছে। একটা অটোমেটিক গাড়ি নিজে থেকেই সামনে কোনো বস্তুকে দেখতে পাবে এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। অর্থাৎ, শুধু চোখ নয়, চোখ-এর যে সংবেদনী বা সেনসরি কাজ সেটাও হবে এবং তা স্নায়ুগত প্রক্রিয়ার মাধমে যেভাবে মোটর রেসপন্স বা কার্যগত প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয় মানুষের দেহে, সেরকম ব্যবস্থাটাও হবে। অর্থাৎ দেখা-স্নায়ুগত প্রক্রিয়া-সিদ্ধান্ত-কার্য— এই চারটি পরপর প্রক্রিয়াই সুসম্পন্ন হবে অটোমেটিক গাড়িতে। রাস্তায় এই গাড়ি এখনও হয়ত আসেনি, কিন্তু কারখানায় এই ধরনের রোবট-গাড়ি চলে।

কম্পিউটারের অবস্থাও সেরকম হতে চলেছে। একটা ঘড়ি বা একটা চশমা-ই হবে আগামী দিনের কম্পিউটার। ইন্টারনেট অন থিংস। ইন্টারনেটের মাধ্যমে যাকে বলে কম্পিউটিং— সেটা দক্ষতার ব্যাপার আর থাকছে না তেমন। আগে নিজের কম্পিউটারে একটা সফটওয়র ইনস্টল করে বা বসিয়ে সেটা চালাতে হত। সেক্ষেত্রে কম্পিউটারটা নিজেই কম্পিউট বা হিসেবনিকেশ করত। কিন্তু ধীরে ধীরে সফটওয়র থাকতে চলেছে কোম্পানির নিজের কাছে। ইউজার বা ব্যবহারকারীর কাছে থাকবে তার সামনের দিকটা (ফ্রন্ট এন্ড) বা ইউজার ইন্টারফেস-টুকুই। এবং হাই স্পিড ইন্টারনেট। আশা করা যায় ফাইভ জি র মাধ্যমে হাই স্পিড ইন্টারনেট চলে এলে আর কোনো সফটওয়রই ব্যবহারকারীর কাছে থাকার প্রয়োজন পড়বে না। ইন্টারনেটের মাধ্যমেই সমস্ত সফটওয়র ব্যবহার করা যাবে। নিজের ডিভাইস বা যন্ত্রে সেটা বসানো বা ইন্সটল করার প্রয়োজনই থাকবে না। স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে এই ব্যবস্থার সাথে আমরা পরিচিত হয়েই চলেছি। অর্থাৎ, কম্পিউটিং বা হিসেবনিকেশ, আরো সাধারণভাবে বললে প্রক্রিয়া বা প্রসেসিং-টা হবে রিমোট-এ বা দূর-এ। তিন দশকেরও বেশি আগে উইনডোজ-এর আগের যুগে কম্পিউটার ছিল কমান্ড আদেশ নির্ভর। তারপর তা ক্রমাগত ব্যবহারকারী বান্ধব বা ইউজার ফ্রেন্ডলি হয়ে চলেছে। এখানে এই যে মেশিনের ব্যবহারকারীর দক্ষতার ওপর নির্ভরশীলতা কমানো হচ্ছে— তার মোটিভ কী? তার মোটিভ হল কম্পিউটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানো। এখন স্মার্ট ফোনেও তা হচ্ছে। একটা সময় ছিল, যখন, যে টাইপ করতে পারে না,

সে কমপিউটার ব্যবহার করতে পারবে না, স্মার্ট ফোন ব্যবহারে সে পিছিয়ে থাকবে। এখন ভয়েস অন টাইপিং বা গলার আওয়াজের মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়ার ব্যবস্থার প্রসারের কারণে আর তারও দরকার হচ্ছে না। কম্পিউটিং-এর প্রাথমিক দক্ষতাগুলিরও আর দরকার হচ্ছে না।

উৎপাদন প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত মেশিনে শ্রমের আধিপত্য কমানো এবং কম্পিউটিং মেশিনকে আরো ইউজার ফ্রেন্ডলি করা— দুটির উদ্দেশ্য একই। মিস্তিরি-কে ইউজার বানানো। কম্পিউটিং মেশিনের সমাজের প্রতিটি আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যাওয়া— এটার যেমন মোবাইল বিক্রির এবং মোবাইলের মাধ্যমে আরো নানা ধরনের জিনিসের বিক্রিবাটা বাড়ানোর মোটিভ আছে নিশ্চয়ই। এটাই মোটিভ হিসেবে দেখা যায়। বস্তুত পুঁজিবাদ মালপত্রের বিক্রিবাটা বাড়ানো এবং লাভ— এই দুটিকেই মোটিভ হিসেবে সামনে রাখে। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বললে 'মার্কেট'-এর সম্প্রসারণ। সেই কারণে পুঁজিবাদ বলতে আমাদের সামনে আসে 'ভোগ'। এই সামনের মোটিভ-এর আড়ালে যে টানাপোড়েনটা চলে, তা হল মানুষ বনাম মেশিন। পুঁজিবাদের উষালগ্নের ইউরোপের লুড্ডাইট-রা খুব সামনে থেকে এটা দেখেছিল। যাকে বলা যায় জীবন দিয়ে দেখা। তাই তারা মেশিনগুলি ভাঙতে শুরু করেছিল। কিন্তু মানুষের বাহির যে মেশিন, অর্থাৎ যাকেই আমরা মেশিন বলে জানি, সেই মেশিন কী? মানুষ মানে জীবন্ত শ্রম। এবং মেশিন হল মানুষের পূর্বতন তথা মৃত শ্রম। মেশিনের মধ্যে ফসিলিকৃত। মেশিনের মালিক যখন মেশিনে যে কাজ করে সে নয়, সে তখন মেশিনকে এমনভাবে পরিবর্তনের যাত্রাপথে নিয়ে যায়, যাতে মেশিনে যে কাজ করে বা চালায়, তার মেশিনের ওপর নিয়ন্ত্রণ কমে যায়। এটা আমরা আগেই দেখলাম। এমনকি মেশিনের দাস-এ পরিণত করারও চেষ্টা করে, যেমন কনভেয়ার বেল্ট প্রযুক্তির মাধ্যমে করা হয়েছিল গত শতকের প্রথম দিকে। সেখানে শ্রমিকদের শ্রম প্রক্রিয়াকেই এমনভাবে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছিল যে সে মেশিনের এক-একটি টুল-এ পরিণত হয়েছিল। মনুষ্যতার এহেন অপমানে সাংস্কৃতিক কর্মী চার্লি চ্যাপলিন আর সহ্য করতে না পেরে সিনেমা বানিয়ে ফেলেছিলেন 'মডার্ন টাইমস' বলে। তবে কাজের মানুষও থেমে থাকেনি। যত আধিপত্যকারী মেশিনই হোক না কেন, তাতে কাজ করা মানুষ সতত চেষ্টা করে গেছে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করার। একদিকে মেশিনের পা বা হাতের দিকে যেটুকু সংলগ্ন থেকেছে মানুষ, সেখানেই সে মেশিনকে তার সহজাত সৃজনক্ষমতার জোরে আধিপত্য করেছে। অপরদিকে মেশিন তার হাত পা চোখ বাড়িয়ে যাওয়ার মাধ্যমে বাধ্য হয়েছে নিজের একটি সুষ্ঠু 'মাথা' তৈরি করার দিকে যেতে যার মাধ্যমে সে নিজের হাত-পা-চোখ গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। মানুষ মেশিনের সেই মাথার দখল নেবার মাধ্যমে ফের মেশিনের ওপর আধিপত্য করেছে। ফলে

মেশিন একদিকে তার হাত পায়ের দিকে মানুষের প্রয়োজনই যতটা পারে কমিয়েছে। এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানুষ আর লাগেই না এরকম পরিস্থিতি তৈরি করেছে। সেমি-অটোমেটিক থেকে অটোমেটিক মেশিনের দিকে যাত্রা করেছে। অপরদিকে মেশিন নিজের মাথার দিকটাকেও এতটাই অটোমেটিক করার চেষ্টা করেছে যাতে নিয়ন্ত্রণের জন্য খুবই কম মানুষ লাগে। এবং সে দক্ষতাও অর্জন করা খুব কঠিন কিছু না হয়। অর্থাৎ, মেশিনে কাজ করা মানুষের মেশিনের ওপর আধিপত্য এড়ানোর জন্য মেশিনের যে বিবর্তন ঘটানো হয়েছে, তাতে মেশিনকে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ জিনিস হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং তা মানুষের আদলে। কেমন মানুষের আদলে? ধরা যাক একজন ড্রাইভার, যে লাল বাতি দেখলে দাঁড়ায়। সবুজ বাতি দেখলে চালায়। আবার সামনে কোনো স্থির বস্তু দেখলে ব্রেক কষে। সামনে কোনো একই দিকে ধাবমান বস্তু দেখলে স্পিড কমিয়ে সেই বস্তুর সমান স্পিডে আনে গাড়িকে। একটি অটোমেটিক গাড়িও নিশ্চয়ই সেরকমই করবে। কিন্তু একজন ঝানু ড্রাইভার কলকাতায় রাস্তায় ভোরবেলায় গাড়ি চালাতে চালাতে যদি দেখে ক্রসিং-এ লাল সিগন্যাল, কিন্তু ডান দিক বাম দিকে কোনও গাড়ি নেই, ট্রাফিক গার্ড দেখা যাচ্ছে না, সিসি ক্যামেরা এই ক্রসিং-এ নেই— তাহলে টুক করে না থেমে বেরিয়ে যাবে। এই বিদ্যেটা তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার অর্জন। অটোমেটিক গাড়ি কিন্তু তা করবে না।

মানুষ

প্রাণীজগৎ সম্পর্কে গবেষণায় পাওয়া গেছে, বহু আগে প্রাণীকূল মস্তিষ্ক-কেন্দ্রিক ছিল না। তার অঙ্গগুলিতেই ছিল স্নায়ুতন্ত্র এবং অঙ্গগুলি স্বাধীনভাবেই কাজ করত। এর একটি চেনা উদাহরণ হল কেঁচো। কেঁচোকে স্পর্শ করলেই সে গুটিয়ে যাবে এবং তা হবে স্থানীয়ভাবেই। তারপর ক্যাম্ব্রিয়ান যুগ-এ যেসব প্রাণীগুলি পাওয়া গেল, সেই বড়ো বড়ো প্রাণীগুলিতে দেখা গেল বহুবিধ সংবেদ আছে। স্পর্শ, শ্রবণ, দর্শন, ব্যাথা, গন্ধ, স্বাদ ইত্যাদি। আবার তাদের বহুবিধ নড়াচড়াও আছে। হাঁটা, ঘোরানো, খপ করে ধরা, এবং হাঁটু-কনুই-কবজি ইত্যাদি পদসন্ধি। এইসব বহুবিধ সংবেদ নানারকম সংবেদন বয়ে আনল, যার একটি হয়ত আরেকটির সঙ্গে খাপ খায় না। কল্পনা করা যাক, একটি জিনিস থেকে কটু গন্ধ বেরোচ্ছে, কিন্তু সেটা খপ করে ধরে মুখে পুরে দেওয়া যায়। এবার সেই আদিম ক্যাম্ব্রিয়ান প্রাণী কটু গন্ধের জন্য সরে আসবে নাকি খপ করে ধরে মুখে পুরে দেবে। তার হাত চাইছে খপ করে ধরতে এবং মুখের দিকে নিয়ে আসতে। নাক বলছে ওটা কাছে আসলেই নাক-মুখ সরিয়ে নিতে। যদি হাত এবং নাক স্বাধীন হয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারে, তাহলে বাধবে গোল। হাত মুখের দিকে জিনিসটাকে

নিয়ে আসবে। আর নাক-মুখ সেটা থেকে সরে সরে আসবে। এর সমাধান প্রয়োজন। দরকার সুসমঞ্জস, সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ আচরণ। যদি হাত হাতের মতো চলে আর নাক নাকের মতো, তাহলে সমূহ বিপদ। বিবর্তনের নির্বাচনী চাপে সে টিকে থাকতে পারবে না। বাস্তবিকই ক্যাম্ব্রিয়ান প্রাণীকুলের পঁয়ত্রিশটি বর্গের মধ্যে মাত্র তিনটি টিকে গেল। যারা টিকে গেল, দেখা গেল, তাদের সংবেদ ও নড়াচড়াও অনেক বেশি বিচিত্র। নানা অঙ্গের এই সুসমঞ্জস, সংগঠিত এবং ঐক্যবদ্ধ আচরণের স্নায়বিক বাস্তবায়নকেই বলা হয় চেতনা। এই স্নায়বিক বাস্তবায়ন যাদের মধ্যে হল তাদের সংবেদ ও নড়াচড়ায় আরো আরো বৈচিত্র্য দেখা দিলেও তাতে সমস্যা তো হলোই না, বরং তা তাদের সাহায্য করল বিবর্তনের ধারায় নির্বাচনী সুবিধা পেতে। কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র বা মস্তিষ্ক এই চেতনার জৈব বাস্তবায়ন বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্যতিক্রমও আছে। যেমন পতঙ্গ-রা। তাদের নড়াচড়া মস্তিষ্ক দিয়ে পুরোটা নিয়ন্ত্রিত হয় না। অঙ্গগুলিতেই নড়াচড়ার স্নায়ুগুলির নিয়ন্ত্রণ থাকে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক কেটে ফেললে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা মারা যাবে, যেহেতু তাদের জীবনদায়ী নড়াচড়াগুলিও কেন্দ্রীয় মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু পতঙ্গের ক্ষেত্রে তা হবে না।

এবার আরও জটিল বিষয়ে প্রবেশ করা যাক। ধরা যাক, কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র যুক্ত বা মস্তিষ্ক যুক্ত একটি প্রাণী, ধরা যাক মানুষ-ই, এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে দৌড়চ্ছে। তার চোখ অবস্থান পরিবর্তন করছে। নতুনভাবে দেখছে সব কিছু। আগে যা দেখল, তার থেকে একটু পরে যা দেখল, তা কতটা আলাদা? বস্তুতঃ তা অনেকটাই আলাদা। আমরা ভাবি আমরা বাস্তবকে দেখছি। কিন্তু আসলে কি আমরা বাস্তবকে দেখি? এই সময়ের মধ্যে যা দেখছি তার প্রচুর বদল হয়েছে। আবার দৌড়তে দৌড়তে দু-বার চোখের দৃষ্টিক্ষেপ-এ চোখের অবস্থানটাই তো বদলে যাচ্ছে। সেই বদলানো অবস্থানের প্রভাব পড়ছে যা দেখছি তার ওপর। তার ওপর, চোখ আগের বার যা দেখছিল, এবার হয়ত তা দেখছেই না। ঘুরে গেছে অন্যদিকে। অন্যকিছু দেখছে। এই সব বদল-ই কি তার পূর্ণাঙ্গ জটিলতা নিয়ে আমাদের দর্শন-এ আসে? না, আসে না। বরং তুলনায় একটা স্থির, এবং না-বদলানো ছবিই আসে। এই যে বদলানো সত্ত্বেও না-বদলানো ছবি দেখা— এই সরলীকরণই হল চেতনার কাজ। চেতনা জটিলতাগুলিকে বাদ দেয়। বিষয়ীর নিজের তৈরি জটিলতা এবং বিষয়ের জটিলতা—উভয়েরই। তুলনায় একটি সরল ছবি তুলে ধরে পরিপার্শ্বের। সেটাই হল বাস্তবতা। বাস্তব আমরা দেখি না। আমরা দেখি বাস্তবতা। যা বাস্তবের চেতনাসঞ্জাত সরলীকৃত এবং স্থিরীকৃত রূপ। যা বাদ দেয় আমাদের সংবেদ ও চলাচলের জন্য তৈরি হওয়া অসংখ্য জটিলতাকে। মস্তিষ্কের মাঝখানের অংশ এই কাজ করে। চেতনার মূল জায়গা হল মস্তিষ্কের মাঝখানের অংশ। মস্তিষ্কের বাইরের পাপড়ির মতো অংশগুলি মূলতঃ জীবদ্দশায় যা যা আহরিত হয় তাকে ধারণ করে চলে।

অর্থাৎ, মানুষ নামের যে প্রাণীটি, যা তার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র তথা মস্তিষ্কের জন্য প্রাণীজগতের বাস্তুতন্ত্রে সবার ওপরে। তার শারীরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত। মস্তিষ্ক নামক অঙ্গ সেই কেন্দ্র। এবং তা পরিপার্শ্বের একটি সরলতর ছবি হাজির করতে পারে, যাতে সে অভ্যস্ত। ফলে তার চেতনা-র জোর-এর জায়গা হল জটিলতাগুলি বাদ দিয়ে বাস্তবতার নির্মাণ। জাগতিক-এর নির্মাণ। এবং তার অর্জিত অভ্যাস-এর সংযোজন। যার মধ্যে পড়বে শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি।

এই অর্জিত অভ্যাস কিছুটা প্রকৃতির সঙ্গে বোঝাপড়ার ফল। বাকিটা সামাজিক ভাবে অর্জিত। যত দিন গেছে, মানুষ প্রাকৃতিক থেকে সামাজিক হয়েছে। এখন আমাদের চারপাশে আমরা যে মানুষ দেখি, তার অর্জিত অভ্যাস মূলতঃ সামাজিক। সামাজিক যাপন থেকে পাওয়া।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মূলতঃ তৈরি হয়েছে মানুষকে অনুকরণ করে। বেশিরভাগ মানুষ যা করে, সেটাকে একটা মডেল ধরা হয়। সেই মডেলটাকে চালানো হয় নতুন কিছুর ক্ষেত্রে। যেমন, আগে ডেস্কটপ কম্পিউটারে লিনাক্স-ভিত্তিক অপারেটিং সিস্টেমে ইম্যাক্স বলে একটা এডিটর বা লেখালেখির সফটওয়র থাকত। সেটা বানিয়েছিল গ্নু-লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমের রিচার্ড স্টলম্যান, যিনি ফ্রি-সফটওয়র আন্দোলন-এর উদ্গাতা ও নেতাও বটে। সেই ইম্যাক্সে একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স মেনু বাটন-ও ছিল। তার নাম ছিল ভারচুয়াল রিয়ালিটি। তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হত, হাই। সে বলত, হ্যালো। তারপর সে কথোপকথন চালাতে থাকত। যেমন, সে যদি জিজ্ঞেস করত, আজ ঠাণ্ডা কেমন? আমি যদি উত্তর দিতাম, প্রচণ্ড। তাহলে সে বলত, ঘরের হিটারটা অন করোনি? আমি যদি বলতাম, করেছি। তাহলে সে উত্তর দিত, কত-তে রেখেছ তাপমাত্রা? আমি যদি বলতাম, ২১, তাহলে সে বলত, একটু বাড়াবে নাকি? ইত্যাদি ইত্যাদি। ঠিক এরকম যে হত, তা নয়। তা আজ মনেও পড়ে না কী রকম কথোপকথন হত। সে প্রায় পনেরো কি সতেরো বছর আগের কথা। কিন্তু এরকমই ছিল। যদি আরেকটু ইন্টেলিজেন্ট হত, তাহলে আমি ২১ বলার পর সে হয়ত বলত, এটা তো বেশ অনেকটাই। তাও তোমার ঠান্ডা লাগছে? আমি যদি উত্তর দিতাম, লাগছে। তাহলে হয়ত সে প্রশ্ন করত, জ্বর আসছে না তো তোমার? শরীরের তাপমাত্রা চেক করবে নাকি? ...তবে সেই সময় এই গোটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাটাই হত যুক্তি-র ওপর দাঁড়িয়ে। অর্থাৎ, সে যখন একটা প্রশ্ন করবে, তখন তার উত্তরে আমি কী কী বলতে পারি, তার একটা লিস্ট আগে থেকে বানিয়ে তার মধ্যে ফিড করে রাখা আছে। সে আমার উত্তর যেটা পাচ্ছে তা থেকে সে ঐ লিস্টের

মধ্যে সব চেয়ে কাছাকাছি যে উত্তরটার সঙ্গে আমার উত্তরটা মেলে, সেটা দেখছে। এবং সেই অনুযায়ী পরের প্রশ্নটা করছে। এই যে সম্ভাব্য উত্তরের লিস্ট তার মধ্যে ফিড করা আছে বা ঢোকানো আছে আগে থেকে, সেটা অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি দিয়ে তৈরি করেছে যে অ্যালগোরিদমটা বা যুক্তিক্রমটা লিখেছে, সে। তারপর প্রোগ্রামটা চলতে চলতে কিছু ভুল নিশ্চয় বের করেছে ব্যবহারকারীরা। সেগুলো তারা 'পোকা' বা বাগ হিসেবে জানিয়েছে প্রোগ্রামার-কে (অর্থাৎ যে যুক্তিক্রমের ওপর দাঁড়িয়ে কোড-টা বা প্রোগ্রামটা বা নির্দেশতন্ত্রটা লিখেছে)। সে আবার সেগুলো একটু ঠিকঠাক করেছে। কিছুদিন পরপর অ্যালগোরিদম যে বানিয়েছে, সেই মডেলার, সে ওই লিস্টটাকে হয়ত আরেকটু লম্বা করেছে। ইত্যাদি প্রভৃতি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এখনকার যে বিস্ফোরণগুলি হচ্ছে, সেগুলিতে এই মডেলার-এর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং যুক্তির সাহায্যে ওই লিস্ট বানানো হবে, তা নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-ও শ্রেণীবিভাজন করবে প্রশ্নটিকে। সেটার উত্তর খোঁজা হবে। কিন্তু উত্তর খোঁজা হবে এক বিশাল ডেটাবেস থেকে। যে ডেটাবেস-এ প্রচুর প্রশ্ন আছে। তার মধ্যে একটি না একটি প্রশ্নের সঙ্গে আমার প্রশ্নটি প্রায় হুবহু মিলে যাবে। ডেটাবেস-এ প্রতিটি প্রশ্নের প্রচুর উত্তর আছে। এই প্রশ্ন এবং উত্তর—কোনওটাই বানানো নয়। সবই নানা মানুষের করা প্রশ্ন (যেমন আমি করেছি) যা বিভিন্ন জায়গা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তরগুলিও নানা মানুষের দেওয়া যা সংগ্রহ করা হয়েছে। এবার আমার প্রশ্নটির সঙ্গে সঙ্গে আমি, যে কি না প্রশ্নটি করেছি, তার প্রোফাইল মেলানো হবে। আমি ধরা যাক, একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, দক্ষিণ কলকাতায় বাড়ি, বিয়ে হওয়া, বাচ্চা আছে, চাকরি করি। এগুলো সবই আমি জেনে বা না-জেনে কখনও না কখনও আমার মোবাইল-কে এবং তার মাধ্যমে আমার মোবাইলের ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে অ্যাক্সেস করা বা কাজে লাগানো ঐ অ্যাপটিকে-ও দিয়ে রেখেছি। সেটা সে সঙ্গে সঙ্গে তার ডেটাবেসের সঙ্গে মেলাবে। দেখবে, আমার মতোই প্রশ্নের যে সম্ভাব্য (ধরা যাক) এক লক্ষটি উত্তর আছে, তার মধ্যে আমার বয়সী, আমার লিঙ্গের, আমার অবস্থানের, আমার ম্যারিটাল স্ট্যাটাস বা বিবাহদশা-র এবং প্যারেন্টাল স্ট্যাটাস বা সন্তানদশার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি কো-রিলেট করছে বা মিলছে যে প্রশ্নকর্তারা, তাদের দেওয়া উত্তরগুলি কতগুলি। সেই উত্তরগুলির মধ্যে থেকে বাছাই করা হবে। এই দ্বিতীয়বার বাছাই করার সময় আরেকটি মাত্রা আসবে। তা হল, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপ-টির উদ্দেশ্য। তার উদ্দেশ্য যদি হয় একটা ব্যবহার্য পণ্যবস্তু গছানো, তাহলে সে সেই মতো উত্তর দেবে। তার উদ্দেশ্য যদি হয় একটু বিরক্ত করা, তাহলে সে সেইভাবে উত্তর দেবে। তার উদ্দেশ্য যদি হয় একটু মশকরা করা, তাহলে সেভাবে উত্তর দেবে। ধরা যাক, এই অ্যাপ-(রো) বট-টি একটি

মেয়ের আদলে বানানো। তাকে আমি প্রশ্ন করলাম, খুব ঠান্ডা লাগছে। কী করব? প্রথম উদ্দেশ্য থাকলে সে বলবে, রুম হিটার নেই বাড়িতে? দ্বিতীয় উদ্দেশ্য থাকলে বলবে, লেপ গায়ে দাও। তৃতীয় উদ্দেশ্য থাকলে বলবে, বউ বাড়ি নেই নাকি? উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাজনের পর বাদবাকি বাছাই-টি র‍্যান্ডাম ভাবে বা এলোপাথাড়ি-ও হতে পারে। এই উদ্দেশ্য বাদে গোটা জিনিসটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখনও অবদি যা, তা। এবং এই উদ্দেশ্যটি অ্যাপ-ব্যবসাটির ধরণধারণ অনুযায়ী তৈরি করে নেওয়া হবে। এটাই হল সেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা তা হয়ে উঠতে চলেছে। এবার ধরা যাক, এমন একটি অ্যাপ বানানো হল, যা নানা উদ্দেশ্য নিয়ে গড়া। দরকারমতো, সুযোগসুবিধা মতো, এবং অবস্থা, উল্টোদিকের ব্যক্তি ও পরিস্থিতি বুঝে যা উদ্দেশ্য নির্বাচন করে নিতে পারে। কীভাবে পারে? তাও ডেটা-ড্রিভেন। অর্থাৎ কিছু তথ্যের ভিত্তিতে পারে। অর্থাৎ তাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে দেওয়া হল রিয়েল-টাইম উদ্দেশ্য ঠিক করে নেবার জন্য। নানা ফ্যাক্টর বা দিক মেপেজুখে সে উদ্দেশ্য অবদি ঠিক করে নিতে পারে নিজে নিজেই। সে উল্টোদিকের ব্যক্তির গলার আওয়াজ শুনে বুঝে নিতে পারে তার মুড কী (তার কাছে থাকা ডেটাবেস-এ গলার আওয়াজের সঙ্গে মুড-এর কো-রিলেশন এর সঙ্গে মিলিয়ে)। এখন ক'টা বাজে, কোন জায়গায় উল্টোদিকের লোকটা থাকে, তার বউ বাচ্চা এখন বাড়ি আছে কি না, সে আজ অফিস থেকে ঠিক সময়ে বেরিয়েছে কি না, কোথায় কোথায় গেছে, ইত্যাদি প্রভৃতি সব ডেটা অ্যাক্সেস করে নিয়েছে বা জেনে নিয়েছে এরই মধ্যে। সবগুলিকে মিলিয়ে জুলিয়ে হিসেব নিকেশ করে সে উদ্দেশ্য ঠিক করে নিচ্ছে। সেই উদ্দেশ্যটাও সে ঠিক করছে এমনভাবে তা যেন লোকটাকে নিরাশ না করে বা লোকটা যেন অ্যাপ ছেড়ে বেরিয়ে না চলে যায়। সে উত্তরগুলোও ঠিক করছে এটার ভিত্তিতে। তাহলে ওই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপটা কী করবে? বলাই বাহুল্য, আমায় নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবে। তাই না? এইটাই হল কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি হালকা এপিটোপ বা শীর্ষ। আমি যখন অ্যাপটির স্মরণাপন্ন হচ্ছি, তখন তো একটা অসহায়তা থেকে সাহায্য চেয়েই হচ্ছি, নাকি? ফলে আমি-ও গ্রহীতা বা রিসিভার এণ্ডে রয়েছি।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা চায় আমাদের মতোই একটি মেশিন বানাতে। সে মেশিন হবে মস্তিষ্ককেন্দ্রিক। তার মস্তিষ্ক তৈরি হবে যে কেন্দ্রীয় অংশটি দিয়ে, অর্থাৎ যা কি না তার চেতনা, তা তৈরি হবে ইন্টেনশন বা মোটিভ বা উদ্দেশ্য দিয়ে। নানা উদ্দেশ্য সেখানে থাকবে। সেটাই হল যাকে বলে আসল জায়গা। যাকে বলে রাজনৈতিক অংশ। এই উদ্দেশ্যমালা তৈরি হবে রাজনৈতিকভাবে। এইখানে কাজ করবে ব্যবস্থা। এইখানে কাজ করবে রাষ্ট্র। এইখানে কাজ করবে ক্ষমতা। এইখানে কাজ করবে ভাবাদর্শ বা ইডিওলজিগুলি। এই চেতনা হবে পরিপার্শ্বের

স্থিতিশীলতা ভিত্তিক, নিজের অনুভবের ও অবস্থানের বদলের মধ্যে দিয়ে পরিপার্শ্ব যে বদলে বদলে যায়, এই ব্যাপারটি বাদ দিয়ে তৈরি হবে। ডেটাবেস এই জন্যই। মস্তিষ্কের বাদবাকি অংশটা তৈরি হবে এখনও অব্দি বেশিরভাগ মানুষ যেভাবে ভাবছে করছে বলছে ইত্যাদি ইত্যাদি তা নিয়ে। গড় করার সময় তা থেকে এদিক সেদিককার ডেটাপয়েন্টগুলিকে আউটলিয়ার বলে বাদ দেওয়া হবে। এবং সে যেহেতু বেসিক্যালি একটি বাইনারি মেশিন, তাই তার সিদ্ধান্ত নিতে কোনও সমস্যা হবে না। যাই হোক না কেন, মেশিন বিকল না হওয়া পর্যন্ত সিদ্ধান্ত বেরোবেই তার থেকে। সেই সিদ্ধান্ত তত 'মানবিক' হবে যত মেশিন-মস্তিষ্কের উপরিউক্ত দুটি অংশের মধ্যে সংশ্লেষ তৈরি করা যাবে। ফলে বিভ্রান্ত, দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগা, উদ্বিগ্ন, একা, চিন্তায় অলস ব্যক্তিমানুষ এই মেশিনকে তার হয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সিদ্ধান্ত নেবার ভারটি দিয়েই ফেলবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই কাজ এখনই বেশ খানিকটা সফল।

কেজো উদাহরণে আসা যাক। সম্প্রতি ফেসবুক নিজেকে একটি ব্র্যান্ড বানিয়ে কোম্পানির নাম 'মেটা' দিয়ে দেবার পরই ফেসবুকে একটা বিজ্ঞাপন এল— 'মেটা' একটা সেমিনার আয়োজন করছে, রাজনীতি ও সরকার পরিচালনা নিয়ে। তার ক'দিন পরই মনে হয় দেখলাম, নরেন্দ্র মোদি কোনও একটা আন্তর্জাতিক সেমিনারে বলেছে, আমরা ডিজিটাল প্রযুক্তির সম্প্রসারণের মাধ্যমে এক নম্বর হব। সারা দেশে একশ তিরিশ কোটি ডেটা আছে আমাদের। ঠিক এরকম না বললেও প্রায় এরকম বলেছে। তার একদিন দু-দিন আগেই কৃষি আইন তিনটে ক্ষমা চেয়ে প্রত্যাহার করেছিল। তার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই আম্বানি বলল এক্কেবারে একই কথা। তার সাথে জুড়ে দিল, লাভ করা অনেক হয়েছে। এবার ডেটার মাধ্যমে অসমতা দূর করা হবে দেশ জুড়ে। ক্রিপ্টোকারেন্সি ভবিষ্যৎ। আর প্রশান্ত কিশোরের আইপ্যাক যে নির্বাচনের ম্যানিফেস্টো স্লোগান প্রার্থী সরকারি প্রকল্প কী হবে না হবে সবই নিয়ন্ত্রণ করছে তা তো দেখাই যাচ্ছে। এরা নিজস্ব পেশাদার সমীক্ষকদের দিয়ে মানুষের বেশিরভাগের মনোভাবটা কী সেটা ছকে নিচ্ছে। এই সব কিছুকে এক জায়গায় করলে বলা যেতেই পারে, আমরা সামগ্রিকভাবে একটা আশু ভবিষ্যতের সম্মুখীন হতে চলেছি, যেখানে সরকার পরিচালনা ও নীতি নির্ধারন এবং তার প্রয়োগ হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগের মাধ্যমে। মূল ধারার রাজনীতি ও নির্বাচন অনেকটাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগকারী কর্পোরেট সংস্থার হাতে চলে গেছে। খুব শীঘ্রই প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে পাল্লা দেবে আম্বানির সংস্থা এবং মেটা-রা। গোটা সরকার পরিচালনাও দ্রুত এই সব সংস্থার হাতে চলে যাবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অ্যাপ ও মেশিনের সাহায্যে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করাও সহজ হয়ে যাবে।

যে কারণে এত গৌরচন্দ্রিকা করা : তাহলে উপায় কী? কীভাবে এই ডিসটোপিয়া-র সাথে লড়াই করা যায়? প্রথম কথা : এই ডিসটোপিয়া-টি কীভাবে ডিসটোপিয়া হয়ে উঠতে পারে, সেদিকে নজর দেওয়া যাক। আমাদের দেশে যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি আছে, সেটি কোনও ব্যবস্থা নয়, একটা ব্যবস্থা-হয়ে-উঠতে-চাওয়া। যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ক্ষমতাতন্ত্রটি চলে, সেটি যদি যেভাবে চলার কথা সেভাবে চলত, তাহলে অন্য নানা কথা উঠত, কিন্তু যে কথাগুলি ওঠে সেগুলি উঠত না। যেমন, এই সংসদীয় গণতন্ত্রে ভোটে কারচুপি হয়। রিগিং হয়। টাকা দিয়ে ভোট কেনা যায়। একেকটা ভোটে প্রচারের খরচে কোনও লাগাম না থাকায় যে দল বেশি ফাণ্ড ম্যানেজ করতে পারে, তাদের জেতার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। প্রতিনিধি নির্বাচিত হবার কথা, কিন্তু মানুষ ভোট দিতে যায় শাসক নির্বাচন করতে চেয়ে। একবার জেতার পর টাকা খেয়ে বা মন্ত্রীত্বের লোভে অন্য দলে চলে যায়। একবার নির্বাচিত হলে তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না। এসবেরও ওপরে আছে পার্টির হুইপ। তারও ওপরে আছে রাষ্ট্রপতি শাসন, সিবিআই ইত্যাদি অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রকে খাটো করে দেওয়া ব্যবস্থাগতভাবেই। একইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেটা চলে তাতে সবার চাকরি পাবার একটা হালকা অধিকার থাকলেও চাকরি পায় মূলতঃ সমাজের ওপরের তলা। তাদের মধ্যেই সমস্ত চাকরি ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়ে যায়। ব্যবসাপাতিও মূলতঃ বংশানুক্রমিক হবার ফলে সেখানে জাতের প্রাবল্য ভয়ানকভাবে বেশি। যার পয়সা যত বেশি থাকে, ভালো উকিল ধরে কেস ডিসমিস করে ফেলার ক্ষমতা তার তত বেশি, তাই দুর্নীতি-ও ধনীদের মধ্যে বেশি। বেশিরভাগ মানুষের আক্ষরিক অর্থেই দিন-আনি-দিন-খাওয়া তাই তাদের কোনও চয়েস বা পছন্দ নেই, তাই তারা কখনওই বাজার বা মার্কেটে ঢুকতে পারে না, সে শ্রমের বাজার হোক বা পণ্যের বা পরিষেবার। বেশিরভাগ মানুষের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টই নেই। যে অংশটি কর্পোরেট ক্ষেত্রে বা সরকারি ক্ষেত্রে চাকরি করে, শ্রমিক, তাদের বাড়িতে যারা কাজ করে— তারাও শ্রমিক। কিন্তু এই দুই শ্রমিকের মধ্যে কী বিস্তর ব্যবধান। ঘন্টা প্রতি বেতন-এর আকাশ পাতাল তফাত। কাজের নিরাপত্তার আকাশ পাতাল তফাত। ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ, শ্রমিকের মধ্যেই একাধিক স্তর। অফিসে যে শ্রমিক, বাড়িতে সে মালিক। আইনি ব্যবস্থাও আসলে ব্যবস্থা হয়ে উঠতে চাওয়া। বেশিরভাগ লোকের প্রশাসন, বিচারসভা— এসব অবধি যাওয়ার সঙ্গতি ও সাহস নেই। কোনও একটা কিছুতে নিজের মত কী, তা ভাবার মতো ফুরসৎ নেই। আমাদের যে সংবিধানটি আছে, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ তা পড়েও না কোনওদিন, বোঝেও না, এবং তার বহু অংশ আমাদের দেশের জনসমাজের স্বাভাবিক ন্যায় বা ন্যাচারাল জাস্টিস-কে প্রতিনিধিত্ব করে না।

গোটা দেশেই নানা পরিসরে বিবাদ বিসম্বাদ মেটানোর নানা অসরকারি প্রথা আগেও ছিল এখনও কমবেশি আছে, যেমন, খাপ, পঞ্চায়েত, সাধারণ সভা, মাঝির বিচার ইত্যাদি। এই যে ব্যবস্থা-হয়ে-উঠতে-চাওয়া ব্যবস্থা— তার কারণে আমাদের দেশের রাষ্ট্র ব্যবস্থা তথা ক্ষমতা ব্যবস্থাটি কখনোই ঠিকভাবে প্রযুক্ত হয়নি, হয় না। উপরে বর্ণিত ডিসটোপিয়াটি আমাদের দেশে জায়গা করে নিতে পারবে এই ইউটোপিয়াটি বাস্তবায়নের কথা বলে। নরেন্দ্র মোদি (কৃষক আন্দোলন পরবর্তী), বা মেটা, বা আম্বানি (ক্রিপ্টোকারেন্সি পরবর্তী), বা প্রশান্ত কিশোর যে স্বপ্ন দেখায় বা দেখাতে চলেছে, তা এই দেশে পুঁজিবাদ, আধুনিক রাষ্ট্র এবং উদার গণতন্ত্র-র যে ব্যবস্থার কথা খাতায় কলমে থাকার কথা— তার স্বপ্ন। তাদের মোদ্দায় বক্তব্য হল বা হতে চলেছে— এতদিন ডিজিটাল যুগ আসেনি বলে এটা সম্ভব হয়নি। এখন তা হয়ে যাবে।

যেটা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, তা হল, এর কিছু কিছু কিন্তু সত্যিই হবে, যা এতদিন হয়নি। সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়, তা খানিক কমবে। লোকে ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কিছুটা সচেতন হয়ে হয়ত কিছু অধিকার দাবি করবে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে অন্ততঃ। কৃষক হয়ত ইন্টারনেট-এ জেনে যাবে, বৃষ্টি কবে হবে ইত্যাদি। হয়ত লক্ষ্মীর ভাণ্ডার জাতীয় প্রকল্পের কারণে লোকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করবে। হয়ত আধার কার্ডের মাধ্যমে রেশন ইত্যাদিতে দুর্নীতি কিছুটা কমবে। হয়ত ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্ট্রারের মাধ্যমে লোকের অর্থনৈতিক অবস্থার সঠিক চিত্র জানা যাবে এবং তার ফলে আমলা ও নীতিনির্ধারকরা এবং অ্যাকাডেমিশিয়ানরা একটা প্রেসক্রিপশন করতে পারবেন যাতে বাস্তবের প্রতিফলন থাকবে। আরো কিছু কিছু নিশ্চয়ই হবে, যার গোটাটা আমরা বুঝতে পারছি না বা আন্দাজ করা যাচ্ছে না। আমূল ডিজিটাইজেশন, সর্বত্র দ্রুতগামী ইন্টারনেট এবং তাকে নিজের মতো ছেড়ে দেওয়া হলে এদেশে পুঁজিবাদ, আধুনিক রাষ্ট্র এবং উদার গণতন্ত্রের হয়ে-উঠতে-চাওয়া-ব্যবস্থাকে কিছুটা হলেও কায়েম করার দিকে যেতে পারত হয়ত মানুষ। কিন্তু এই আমূল ডিজিটাইজেশন-এর উদ্যোগ এদেশে আসছে যে সময়ে, তখন এই আমূল ডিজিটাইজেশন-কে কাজে লাগিয়ে ফের পাঁচিল তুলতে সক্ষম কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক প্রায়-মানুষ মেশিনটি বাজারে এসে গেছে। এবং যারা এই আমূল ডিজিটাইজেশন আনছে, তারা সেটা আনছেই এই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক প্রায়-মানুষ মেশিনটিকে ছাড়বার জন্য। যা আমূল ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে যতটুকু যা স্বাধীনতা অর্জিত হত মানুষের, তার পায়ে বেড়ি পরাবে। মানুষকে 'নর্মালাইজ' করবে। মানুষকে 'বাবা কাকাদের মতো' চালাতে চাইবে। 'বেশিরভাগ মানুষ'-এর মতো চালাতে চাইবে। মানুষকে আধিপত্যকারী ভাবাদর্শ, বিজ্ঞান, তত্ত্ব, ভাষ্য, ভাষা, সাহিত্য অনুসারী করতে চাইবে। ওইগুলোর মতো করে তার সদ্য অর্জিত পছন্দ বা চয়েস-কে ঘিরে ফেলতে চাইবে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার শেকল না তৈরি হলে আমূল ডিজিটাইজেশন

এবং ইন্টারনেটের জরুরি পরিষেবা করে তোলার ব্যাপারে ক্ষমতাসীনদের কোনও আগ্রহ থাকত বলে মনে হয় না। উদাহরণ স্বরূপ ভেবে দেখা যেতে পারে, কয়েক বছর আগে, সম্ভবতঃ ২০১৪-১৫ সালে ফেসবুক এবং আম্বানির যৌথ উদ্যোগে একটি 'ইন্টারনেট' আনার চেষ্টা করা হয়েছিল, যেটাতে 'ইন্টারনেট' আসলে একটা প্যাকেজ, যা দিয়ে কয়েকটি (গোটা পঞ্চাশেক) ওয়েবসাইট-কে অ্যাক্সেস করা যাবে। সেটাকেই ইন্টারনেট বলে চালানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের একটা বড়ো অংশের এখনকার মুক্ত ইন্টারনেট-কে কর্পোরেট প্যাকেজ হতে দিতে চায়নি, এবং তার সোচ্চার বিরোধিতা করেছিল। সেই বিরোধিতায় এবং ভিপিএন, টর ব্রাউজার ইত্যাদি নজর-এড়ানোর প্রযুক্তির কারণে তাদের সেই উদ্যোগ সফল হয়নি। অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়েছিল। কিন্তু ইন্টারনেটের সম্প্রসারণ এবং ডিজিটাইজেশন-ও এগোয়নি তেমন। যা এগোচ্ছে অতি সম্প্রতি। তারও আগে, গত শতাব্দীর শেষ দশকে সফটওয়র বা ডিজিটাল দুনিয়াটাকেই প্যাকেজ বানানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। নেতৃত্ব দিয়েছিল মাইক্রোসফট এবং অ্যাপল। বিল গেটস এবং স্টিভ জোবস। কিন্তু লাইনাস তোর ভাল্ডস, রিচার্ড স্টলম্যান ইত্যাদি মুক্ত সফটওয়র আন্দোলনের যোদ্ধাদের কারণে তা সফল হয়নি। যাক সে কথা।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক প্রায়-মানুষ মেশিনটির সঙ্গে লড়তে গেলে আমূল ডিজিটাইজেশন এবং সর্বত্র ইন্টারনেট-কে বিরোধিতা করলে সে আসলে ডিসটোপিয়া হলেও একটা ইউটোপিয়ার ছদ্মবেশ নিয়ে নিতে সক্ষম হবে। ফলে ওই পথে বিরোধিতায় কতদূর কী করা যাবে বলা যাচ্ছে না। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মেশিন পুঁজিবাদ, আধুনিক রাষ্ট্র এবং উদার গণতন্ত্রের যে মূল আত্মা— ব্যক্তিস্বাধীনতার ইউটোপিয়া— তাকে জলাঞ্জলি দেয়। তার মাধ্যমে সে একটি উত্তর-পুঁজিবাদের ভাষ্য তৈরি করে। ব্যক্তি বা ব্যক্তিস্বাধীনতার ইউটোপিয়াকে আঁকড়ে ধরে তার একটা বিরোধিতা গড়ে তোলা যায় বটে, কিন্তু তা করতে গেলে যে তা গড়ে তুলছে তার তুমুল রক্তক্ষরণ হতে বাধ্য। ব্যক্তি বা ব্যক্তিস্বাধীনতার ইউটোপিয়া কোনওদিনই সফল করা যায়নি। এমনকি পুঁজিবাদের গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিতেও না। ফ্যাসিবাদ ও সাম্যবাদ পরবর্তী নয়াউদারবাদে সেই ইউটোপিয়ার আগুন আবার জ্বালানো হয়েছিল বটে। কিন্তু তার করুণ পরিণতি আমরা চোখের সামনে দেখতে পেয়েছি এবং পাচ্ছি। নয়াউদারবাদ তথা বিশ্বায়ন এ পৃথিবীর কোনও সমস্যার সমাধান তো করতে পারেইনি, বরং বাড়িয়েছে। অসমতা বেড়েছে। পরিবেশ ধ্বংস বেড়েছে। দুর্নীতি বেড়েছে। পুঁজিবাদ ২০০৮ সালে নতুন যে সঙ্কটের গর্তে পড়েছে তা থেকে আজ অবদি বেরোতে পারেনি। নয়া ফ্যাসিবাদী রাজনীতি ছেয়ে গেছে গোটা দুনিয়ায়। ফলে ফের সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিস্বাধীনতার ইউটোপিয়াকে আঁকড়ে ধরে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা নামক মেশিনটির সঙ্গে লড়তে গেলে তা পরিহাস হয়ে যাওয়ার সম্ভবনা প্রবল। আরেকটি উপায়

হল, মস্তিষ্ক-কেন্দ্রিক মানব-অস্তিত্ব থেকে সরে আসার চেষ্টা করা। সেটা একেবারেই সহজ, আবার অত্যন্ত কঠিন। কঠিন, কারণ তা যদি সচেতনতা বা চেতনার সঙ্গে করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে হবেই না। অন্যদের কথায় নাচতে পারলে, অন্যদের দরকারে সিরিয়াস হতে পারলে, অন্যদের দুঃখে জেনুইন সমব্যাথী হতে পারলে, অন্যদের আনন্দে অনাবিল শিশুসুলভ আনন্দ পেতে পারলে, নিজের সুবিধা বা ভালোলাগার জন্য অন্যদের কথা ভাবার বদলে অন্যদের মতো করে অন্যদের ব্যাপারে ভাবতে পারলে, অন্যদের প্রয়োজনে নিজের সময় ব্যয় করতে পারলে, অন্যদের সাথে নিজের প্রায় সমস্ত 'আমার জিনিস' শেয়ার করতে পারলে —সংক্ষেপে, নিজেকে ব্যক্তি থেকে আশেপাশের ও আগেপিছের ব্যক্তিদের সমাবেশ বানাতে পারলে বা আড়ব্যক্তি হতে পারলে— মস্তিষ্ক-কেন্দ্রিক মানব-অস্তিত্ব থেকে সরে আসা যায়। সহজ, কারণ আমাদের সামাজিক অস্তিত্বে এবং কৌম অস্তিত্বের স্মৃতিতে এর অনেক কিছুই আছে। আমাদের মস্তিষ্ক চায় আমাদের হাত পা পিঠ পেছন পেট চোখ কান নাক হৃদয় মুণ্ডু মাথা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে। পরিপার্শ্বের জটিলতা থেকে আমাদের মুক্ত রাখতে। একটা সরল স্থির এলেবেলে পরিপার্শ্বের ধারনা তৈরি করতে, যাকে বলে চেতনা বা কনসাশনেস। আমাদের মস্তিষ্ক চায়, নিজেদের হাত পা মুণ্ডু মাথা চোখ কান -এর কারণেও যে পরিপার্শ্বের নিরন্তর পরিবর্তন হয়, সেসব ছাঁটকাট করে নিয়ে পরিপার্শ্বে একটা সরলীকরণকে উপস্থিত করতে আমাদের কাছে। মস্তিষ্ক চায় আমরা সচেতন হই। সচেতন, সুসমঞ্জস দেহমন হোক আমাদের। সেই মতো চলুক আমাদের হাত পা ইত্যাদিরা। কিন্তু আমাদের অঙ্গগুলি, ওগুলো আসলে স্বতন্ত্র সবদিক থেকেই। সেই স্বাতন্ত্র্য উদ্ভাসিত হয় যদি সঙ্গী পায়। মস্তিষ্ককে পাত্তা না দিয়ে আমাদের পাদুটোকে যদি অন্যদের পায়েদের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চিত তারা মাঠে দাপাদাপি করবে। ...হাত দুটোকে যদি অন্যদের হাতেদের সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া যায়, তাহলে নিশ্চিত তারা কোরাস বাজনা তৈরি করবে। ...হৃদয়কে যদি অন্য হৃদয়গুলোর সঙ্গে ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলে নিশ্চিত তারা শীতের রাতে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে শীতে কাতর মানুষদের শীতবস্ত্র দিয়ে বেড়াবে। ইত্যাদি ইত্যাদি। আড়ব্যক্তি আমি-র সামাজিক পা সামাজিক হাত সামাজিক পেছন সামাজিক আঙুল সামাজিক চোখ ...এরা মস্তিষ্ক-কেন্দ্রিক প্রায়-মানুষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মেশিনের কব্জা থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে। তাকে কব্জা করতে পারে। চেতনার সরলীকরণ থেকে আমাদের মুক্ত করতে পারে। জটিলতাকে আপন করতে পারে...। কীভাবে পারে তা পরের ব্যাপার। আপাততঃ কে পারে সেই আলোচনাটুকু করেই এই লেখার ইতি টানা যাক।

কথা

উনবিংশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা

প্রকাশকাল : জানুয়ারি-মার্চ ২০২২

একটি রেলকর্মী প্রয়াস

সম্পাদনায় : **সামসুদ্দিন মণ্ডল** প্রকাশনায় : **অসীম রঞ্জন ভট্টাচার্য**

যোগাযোগে

সামসুদ্দিন মণ্ডল ৯৪৩৪৪৬৮৬৩০/মিতা **বসু** ৯৮৩০৪১৪৮৪৩

কথা

ঊনবিংশ বর্ষ ● প্রথম সংখ্যা

ডিসটোপিয়ার সাথে লড়াই

কোন সে আলোর স্বপ্ন

ছদ্মবেশী

প্রথম পাহাড় চূড়া

তোড়না হ্যায় ফির জোড়না হ্যায়